গীতিকা :

গীতিকা হল গীতোপযোগী ছন্দোবদ্ধ রচনা এবং লোকসাহিত্যের নবীনতম শাখা। গীতিকা হল সেই জাতীয় লোকসংগীত, যার একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনি থাকে। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় কাহিনিধর্মী লোকসংগীত হল গীতিকা। নাটকীয়তা গীতিকার একটি প্রধান গুণ। গীতিধর্মী রচনা হলেও এটি পাঠ করে সাধারণ কাব্যপাঠের মতোই আনন্দ পাওয়া যায়।

বাংলা গীতিকার ত্রি-ধারা

বাংলা গীতিকার তিনটি ধারা বর্তমান— ১) নাথ-গীতিকা

২) মৈমনসিংহ গীতিকা ও

৩) পূর্ববঙ্গ গীতিকা

নাথ-গীতিকা : নাথ-গীতিকা উত্তরবঙ্গের নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় তত্ত্বভিত্তিক রচনা। এই নাথ-গীতিকার দুটি প্রধান ভাগ আছে—একটি নাথগুরুদের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনি আর একটি তরুণ রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনি। প্রথম ভাগটিকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত যে সকল গীতিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা 'গোরক্ষবিজয়', বা 'মীনচেতন' নামে পরিচিত। আর দ্বিতীয় বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যে সকল গীতিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা 'মানিকচন্দ্র রাজার গান', গোবিন্দচন্দ্রের গীত', 'ময়নামতীর গান', 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত। নাথ-গীতিকাগুলি প্রধানত উত্তরবঙ্গেই প্রসার লাভ করেছিল, সেখানে এটি যুগীযাত্রা নামে পরিচিত।

নাথ-গীতিকার অন্তর্গত 'গোরক্ষবিজয়', 'মীনচেতন' অংশটির মধ্যে একটি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ কাহিনির নায়ক গোরক্ষনাথ একটি সমুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর গুরু মীননাথকে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সিদ্ধগুরু মীননাথ রমণীর মোহে আবদ্ধ হয়ে তাঁর

সমস্ত সাধনভজন জলাঞ্জলি দিলে, পুত্রতুল্য শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুকে এই ইন্দ্রিয়াসক্তির জগৎ থেকে উদ্ধার করে আবার সাধনার ক্ষেত্রে ফেরান। গুরুকে উদ্ধার করতে গিয়ে গোরক্ষনাথকেও ইন্দ্রিয়জয়ের অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সকল বাধা জয় করে গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথকে প্রকৃত জ্ঞানচেতনায় ফিরিয়ে আনেন, তাই এ গীতিকা 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন' নামে পরিচিত।

'গোরক্ষবিজয়ে'র তুলনায় 'গোপীচন্দ্রের গান' বা 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' অনেক বেশি মানবিক আবেদনপূর্ণ। রাজা মানিক ও রানী ময়নামতীর সন্তান গোপীচন্দ্র। রানী ময়নামতী ডাকসিদ্ধা নারী, ছেলে গোপীচন্দ্রকে বিয়ে দেবার পর তিনি বুঝলেন যে, ছেলেকে কিছুদিন সন্ন্যাসব্রত পালন করানো কর্তব্য তা না হলে ছেলেকে বাঁচানো যাবে না। তাই তিনি ছেলেকে হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বলায় ছেলে গোপীচন্দ্র প্রতিবাদ করে ওঠে। সংসারে নববিবাহিতা দুই স্ত্রী আদুনা ও পদুনা, তাদের ছেড়ে গোপীচন্দ্র কিছুতেই হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে রাজী নয়। ভোগের বাসনা তাঁর সন্ন্যাসের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মায়ের নির্দেশ শেষ পর্যন্ত গোপীচন্দ্রকে মানতে হল। সন্ন্যাসের পথে পা বাড়িয়েও গোপীচন্দ্র বার বার ফিরে তাকিয়েছে ভোগের প্রাসাদের দিকে, পেতে চেয়েছে রমণী সঙ্গসুধা। এই শাশ্বত মানবিক ধর্মের গুণেই মানিকচন্দ্র-গোপীচন্দ্রের গান সহজেই মানব-মন অধিকার করেছে।

মৈমনসিংহ গীতিকা : মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার বিষববস্তু মূলত প্রেম। বাংলা সাহিত্যের লিখিত ধারা মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ কাব্য, বৈষ্ণবকাব্য যখন ধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিল, তখন দেবতার পূজার ভিড়ে মানুষের কাহিনি নিয়ে আবির্ভূত হল মৈমনসিংহ গীতিকা। লোকসমাজে প্রচলিত এই গীতিকাগুলি বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এল একটা নতুন ধারা, সে ধারা মানবিক ধারা।

ব্রহ্মপুত্র নদ মৈমনসিংহ জেলাকে পূর্ব-পশ্চিম দু'ভাগে ভাগ করেছে। এর মধ্যে পূর্বভাগ বিশেষত নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমাতেই এই মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি প্রচলিত ছিল। মৈমনসিংহ জেলায় বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী হাজং

গোষ্ঠীর মধ্যে এই গীতিকাগুলির উদ্ভব ও প্রচলন হয়েছিল। তাই এই অনামি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বেশ কিছু প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায় মৈমনসিংহ গীতিকায়। মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলির অভিনবত্ব সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। প্রেমের জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষায়, ধৈর্য ও বুদ্ধিতে মৈমনসিংহ গীতিকার নারীরা অসাধারণ।

মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি মৈমনসিংহ জেলার কৃষক সম্প্রদায়ের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে চন্দ্রকুমার দে এই গীতিকাগুলি সংগ্রহ করেন, যা ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়।

মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনি নাথ-গীতিকার মতো যেমন কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক নয়, তেমনি আবার একটি মাত্র কাহিনিকেন্দ্রিকও নয়। ১৯২৩ সালে মৈমনসিংহ গীতিকায় মোট দশটি গীতিকা—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারাম পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা, এবং দেওয়ান মদিনা স্থান পেয়েছে।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা : বাংলা গীতিকার তৃতীয় ধারাটি হল পূর্ববঙ্গ গীতিকা। আমরা আগেই আলোচনা করেছি পূর্ববঙ্গ গীতিকার দুই-তৃতীয়াংশ কবিতা মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্ভূক্ত। মৈমনসিংহ গীতিকা ছাড়াও ত্রিপুরা, নোয়াখালি, মৈমনসিংহ চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলি দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনাতেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য-পুষ্ট হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে প্রকাশিত হয়। মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলো আবার দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ইংরাজিতে অনুদিত হয়ে Eastern Bengali Ballads –Mymensingh নামে প্রকাশিত হয়।

মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার তিনটি খণ্ড মিলিয়ে সংকলিত গীতিকার সংখ্যা ৫৪টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ধোপার ঘাট, মইষাল বন্ধু, কাঞ্চনমালা,

ভেলুয়া, কমলা রানীর গান, মদনকুমার ও মধুমালা, আয়না বিবি, সোনাবিবির পালা ইত্যাদি।

নাথ-গীতিকার মতো মূলত দুটো বিষয় বা কাহিনি অবলম্বন করে মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকা রচিত হয় নি। এখানে এক একটি পৃথক কাহিনি। তবে কাহিনি পৃথক হলেও বৈচিত্র কম। প্রায়ই এক কাহিনির সঙ্গে অন্য কাহিনির মিল দেখা যায়।

মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনিগুলো যেমন এককভাবে চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেছিলেন, পূর্ববঙ্গ গীতিকার কাহিনিগুলো কিন্তু কোন একক মানুষের সংগ্রহ নয়। এক্ষেত্রে সংগ্রহকারী ছিলেন –আশুতোষ চৌধুরী, কবি জসিমুদ্দিন, নগেন্দ্র চন্দ্র দে, বিহারীলাল রায়, শিবরতন মিত্র প্রমুখ।

গীতিকা : কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য

- বাংলা গীতিকার প্রধান বিষয় নরনারীর প্রেম। মৈমনসিংহ-গীতিকার দশটি পালার মধ্যে নয়টিই প্রেমমূলক, একটি দস্যুতামূলক। প্রেমগাথার নায়ক-নায়িকারা বর্ণ-বিত্ত-কূল-ধর্মের দিক থেকে কেউ সমস্তরের, কেউ বা অসমস্তরের। নায়ক-নায়িকার প্রেমে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সামন্তপতি, তার প্রতিনিধি, বিত্তশালী ও অন্যান্য ক্ষমতাধর ব্যক্তির রূপতৃষ্ণা, প্রণয়বাসনা, কামপ্রবৃত্তি ইত্যাদির কথা আছে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন, উচ্চবর্গের ইন্দ্রিয়াসক্তি, সম্ভোগপ্রিয়তা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, সমাজের রক্ষণশীলতা, আভিজাত্যের অহঙ্কার, বহুবিবাহ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদিও গীতিকাগুলিতে স্থান পেয়েছে। সমাজের নিষ্ঠুর বিধিনিষেধের কারণে কিছু কিছু গাথা, যেমন ‘কঙ্ক ও লীলা’, ‘শ্যামরায়’, ‘ধোপার পাট’, ‘দেওয়ানা

মদিনা', 'ফুলকুমারী', 'চন্দ্রাবতী', 'মহুয়া' ইত্যাদি বিয়োগান্তক পালায় পরিণত হয়েছে।

- গীতিকা রচয়িতার মধ্যে থাকে এক ধরনের নিরাসক্ত চেতনা। বিষয়বস্তুতে থাকে একটিমাত্র ঘটনা বা সঙ্কটপূর্ণ কাহিনি। নাটকীয়তা ও সংলাপধর্মিতা এর প্রধান গুণ। গীতিকার কাহিনি ক্রিয়া, চরিত্র, পরিবেশ ও বিষয়বস্তু এ চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্রিয়াই (action) প্রধান হয়ে নাটকীয় গুণ অর্জন করে। ঘটনার উত্থান-পতনে চমক ও বিস্ময় সৃষ্টি হয়। ঘন-সন্নিবিষ্ট নিচ্ছিদ্র ঘটনাজাল এবং অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা পরিহার করে কেবল মূল ঘটনাপ্রবাহই পরিণতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। ধারাবাহিক ও বিস্তৃত বর্ণনার স্থলে কাহিনির মধ্যস্থিত কতিপয় সঙ্কটময় মুহূর্তের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয় এবং তাতেই কাহিনি সমগ্রতা লাভ করে। কোনো শাখা বা উপকাহিনীর ভারে এর গতি মন্থর করার সুযোগ নেই।
- গীতিকার চরিত্রসমূহ প্রায়শ একপ্রকার আদর্শায়িত (typed) রূপ লাভ করে, তবে মাঝে মাঝে তা নাটকের মতো সুস্পষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণও হয়ে ওঠে। গীতিকা গীত হয় দেশি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গতানুগতিক সুরে। কিন্তু কাহিনি মূল লক্ষ্য হওয়ায় সুরের একঘেয়েমি শ্রোতার কাছে অপ্রীতিকর মনে হয় না। আর এখানেই লোকসংগীতের সঙ্গে গীতিকার পার্থক্য। লোকসংগীতে সুরই মুখ্য, কথা গৌণ। গীতিকায় এর বিপরীত অবস্থা। আদিম সমাজে গীতিকার উদ্ভব হয়নি, একটি সংহত লোকসমাজে এর উদ্ভব। এর অর্থ গীতিকা মূলত কোনো ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অধিকারী সমাজ ও অভিজ্ঞ কবিমনেরই সৃষ্টি।
- গীতিকা মৌখিক সাহিত্য তাই গীতিকা মনে রাখার জন্য কতগুলি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমন, কোনো কোনো অংশের পুনরাবৃত্তি, বাংলায় যাকে বলা হয় 'ধুয়া'। সেই 'ধুয়া'র ব্যাপক ব্যবহার গীতিকায় প্রায়ই করা হয়।

- গীতিকার সৃষ্টি নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। একশ্রেণীর সমালোচক গীতিকা ও লোকসংগীতে মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুভব করেন নি। তাদের ধারণা, লোকসংগীতে অন্যান্য শাখার মতো গীতিকাও কোনোও এক সংহত সমাজের ঐক্যবদ্ধ সৃষ্টি। এ মত পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তিত হয় এবং ধারণা করা হয়, ব্যক্তিবিশেষের অধিনায়কত্বে জনসাধারণই এর রচয়িতা। যিনি অধিনায়কত্ব করতেন তিনি সম্পাদনারও দায়িত্ব পালন করতেন; অর্থাৎ গীতিকার অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়ে সামগ্রিকভাবে এর একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়ে তুলতেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকরা এ উভয় মত খন্ডন করে বলেছেন, ব্যালাড ব্যক্তিপ্রতিভারই একক সৃষ্টি। তবে ব্যক্তির সৃষ্টি-সংক্রান্ত এ সত্যটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ গায়ক নিজেকে কখনও এককভাবে উপস্থাপন করেন না এবং একটি ব্যালাড কখনোই ব্যালাড হতে পারে না, যতক্ষণ না তা লোকসমাজ গ্রহণ করে। গীতিকা বা ব্যালাডের সৃষ্টি নিয়ে নানা মতের অস্তিত্ব থাকলেও সকলেই স্বীকার করেছেন যে, গীতিকা আদিম সমাজের নয়, উন্নততর সমাজের সৃষ্টি। আদিম সমাজে সংগীত বা লোকসংগীতের অস্তিত্ব থাকলেও গীতিকার অস্তিত্ব ছিল না।

- আরও একটি বিষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত যে, গীতিকার উদ্ভব ঘটেছে মহাকাব্য সৃষ্টির পরবর্তী যুগে। এর প্রমাণ, গীতিকার মধ্যে মহাকাব্যের অনেক বিষয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সমালোচকেরা আরও সহমত পোষণ করেন যে, গীতিকায় কেবল সমসাময়িক ঘটনা কিংবা ভাববস্তুরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, সমাজ-সংস্কৃতিতে বিধৃত প্রস্তরীভূত আদিম উপকরণেরও প্রতিফলন ঘটে। ফলে গীতিকাকে জাতীয় ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণের আধার হিসেবে গণ্য করা যায়।

- গীতিকা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে একশ্রেণীর লোক এগুলি মুখস্থ করে বিভিন্ন উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানে পরিবেশন করত। তারা ছিল সাধারণত

নিরক্ষর; স্মৃতিই ছিল তাদের একমাত্র অবলম্বন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের নানা নামে অভিহিত করা হতো। যেমন, উত্তর-পশ্চিম ভারত ও কাশ্মীরে 'গীতিকা-ব্যবসায়ী', রাজপুতানায় 'চারণ', মধ্যপ্রদেশে 'পরধান', বাংলায় 'ভাট' প্রভৃতি। এরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে গীতিকা পরিবেশন করে জীবিকা নির্বাহ করত।

- বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত যেসব গীতিকা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়: পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও নাথগীতিকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দিনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে চারখন্ডে পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশিত হয়। তাতে গীতিকার সংখ্যা ৫৪টি। এ ছাড়া ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকের সম্পাদনায় সাত খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা। এতে অবশ্য নতুন কোনো গীতিকা সংকলিত হয়নি। দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত গীতিকারই সংশোধিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ তিনি সংকলিত করেন। দীনেশচন্দ্র সেন ও ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলির মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক গীতিকা (প্রায় ৩৯টি) মৈমনসিংহ অঞ্চলের; বাকিগুলি সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। মৈমনসিংহের আরও কিছু গীতিকা এবং অন্যান্য জেলা থেকেও কিছু গীতিকা পরবর্তীকালে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে।

- ময়মনসিংহ ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলির শিল্পমান ততটা উৎকৃষ্ট নয়। সে কারণে অনেক সমালোচকই ময়মনসিংহের গীতিকাগুলিকে অন্যান্য অঞ্চলের গীতিকা থেকে আলাদা দেখতে আগ্রহী। স্মরণীয় যে, বিদেশি মনীষীরা দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত মৈমনসিংহ-গীতিকার (পূর্ববঙ্গ-গীতিকার ১ম খন্ড) ইংরেজি ভাষ্য পড়েই প্রশংসামুখর হয়েছিলেন। এসব গীতিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 'মহুয়া', 'মলুয়া',

‘চন্দ্রাবতী’, ‘দেওয়ানা মদিনা’, ‘কঙ্ক ও লীলা’, ‘কমলা’, ‘দেওয়ান ভাবনা’ প্রভৃতি।

- নাথগীতিকাগুলি প্রধানত উত্তরবঙ্গে প্রচার লাভ করেছিল। সেখানে এগুলি ‘যুগীযাত্রা’ নামে পরিচিত। বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী গীতিকাকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন: ১. খাঁটি প্রেমমূলক: (মহুয়া, মলুয়া, কমলা) ২. ধর্মকেন্দ্রিক প্রণয়: (চন্দ্রাবতী) ৩. রূপক-প্রণয়মূলক: (কঙ্ক ও লীলা) ৪. বিবাহোত্তর প্রণয়: (দেওয়ানা মদিনা) ৫. ঐতিহাসিক: (ঈশা খাঁ মসনদালি) ৬. দস্যুবৃত্তিমূলক/লোকনায়কভিত্তিক: (দস্যু কেনারামের পালা) ৭. স্থানভিত্তিক: (বারতীর্থের গান) ৮. বারমাসী: (বগুলার বারমাসী) ৯. রূপকথাধর্মী: (কাজলরেখা) প্রভৃতি।